মক্কা কি দারুল-হারব হতে পারে?

মক্কা কি দারুল-হারব হতে পারে?

শায়খ ইমাম হামাদ বিন আতিক (রহঃ)(১)কে তার সমসাময়িককালে একজন প্রশ্ন করেছিলো

যে,মক্কা ও এর লোকজনের ব্যাপারে ইসলামের হুকুম কী হবে? শায়খ উত্তরে নিচের কথাগুলো বলেছিলেন(২)-

আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা বলেন,

قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٣٢﴾

তারা বলল, তুমি পবিত্র, আমরা কোন কিছুই জানি না, তবে তুমি যা আমাদেরকে শিখিয়েছ (সেগুলো ব্যতিত) নিশ্চয় তুমিই প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন, হেকমতওয়ালা।(সূরা বাকারাঃ ৩২)(৩)

বর্তমানে মক্কার ব্যাপারে যে প্রশ্নটি উঠেছে সেটি হল- “মক্কা কি এখন দারুল-ইসলাম নাকি দারুল-কুফর?”

এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে আমি আমার মতামতটি জানাচ্ছি।

আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা মানুষ সৃষ্টির পর থেকে যুগে যুগে তাদেরকে শিখানোর জন্য নবী রাসুলগণকে সত্য দ্বীন সহকারে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। প্রতিটি দ্বীন এর মূল ভিত্তি ছিল তাওহীদ। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কেও আল্লাহ্‌ তা’আলা ঐ একই তাওহীদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন। তাওহীদের মূল শিক্ষাটি হল “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” এটিকে মুখে স্বীকার করা ও কাজের মাধ্যমে বাস্তব রূপ প্রদান করা। বান্দা একমাত্র আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কারও ইবাদত করবে

না। আল্লাহ্ ছাড়া আর কারও কাছে দোয়া করবে না বা কিছু চাইবে না। এখানে যে ইবাদত বা দোয়া(৪) এর কথা বলা হচ্ছে তাকে ৫টি ভাগে ভাগ করা যায়-

১. খাওফ (আল্লাহ্ তা’আলাকে ভয় করা)

২. রাজা (আল্লাহ্ তা’আলার নিকট হতে আশা করা)

৩. তাওয়াককুল (আল্লাহ্ তা’আলার উপড় ভরসা করা)

৪. ইনাবাহ (আল্লাহ্ তা’আলার কাছেই তওবা করা ও তার কাছে ফিরে আসা)

৫. থাবহ (আল্লাহ্ তা’আলার জন্যই উৎসর্গ করা)

৬. সালাত (আল্লাহ্ তা’আলার কাছে দোয়া করা/ আল্লাহ্ তা’আলার জন্য নামাজ পরা)

ইবাদতের কয়েকটি রূপ বা প্রকারভেদ রয়েছে (৫)। তাওহীদের শিক্ষার ১ম শর্ত হল এই সকাল প্রকারের বা রুপের ইবাদত একমাত্র আল্লাহ্ তা’আলার জন্যই করতে হবে। কেউ যদি এই ই বাদতের মধ্যে অন্য কাউকে বা কিছুকে শরিক করে তাহলে তার ইবাদত কবুল হবে না। কেননা যে কোন ধরণের ইবাদত কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত হল সেটি একমাত্র আল্লাহ্ তা’আলার জন্য হতে হবে।

দ্বিতীয় শর্ত হল, নবীজি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আনুগত্য করতে হবে। তার আদেশ-নিষেধগুলো মেনে চলতে হবে, ছোটবড় সকল বিষয়ে তার বিচার মেনে নিতে হবে। তিনি যে আসমানি শরিয়াহ নিয়ে এসেছিলেন তার আনুগত্য করতে হবে। দ্বীনের মৌলিক ও গৌণ সকল বিষয়ে তার আদেশ-নিষেধের আনুগত্য করতে হবে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, প্রথম শর্তের মাধ্যমে শিরককে অস্বীকার করা হচ্ছে। শিরক ও তাওহীদ একসাথে থাকতে পারে না। আর দ্বিতীয় শর্ত বিদআতকে অস্বীকার

করছে। বিদআত ও নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুসরণ একসাথে হতে পারে না।

সুতরাং যে বা যারাই উপরের দুইটি শর্তের ব্যাপারে জ্ঞান অর্জন করবে, অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী আমল করবে এবং লোকজনকে দাওয়াত দিবে তারাই সঠিক পথে আছে বলে ধরা হবে। পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তের যে কোন শহরের লোকজন যদি উপরের শর্ত অনুযায়ী জ্ঞান অর্জন করে, সে অনুযায়ী আমল করে ও এই হক পথের দিকে দাওয়াত দেয় এবং যারা এই পথে চলে তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে ও এই পথের বিরোধিতাকারীদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে তবেই তারাই হবে 'মুওয়াহ্হিদিন'। আর এরাই হচ্ছে সঠিক পথের অনুসারী।

আর যদি কোন শহরে ভয়াবহভাবে শিরক ছড়িয়ে পরে যেমন, আল্লাহ্ এর কাছে চাওয়ার বদলে তারা যদি ক্বাবা, মাকামে ইব্রাহিম, হাতিম, নবীগণ ও পুণ্যবান সালাফদের কাছে দোয়া করে বা চায় তাহলে সেখানে ইসলামী পরিবেশ কায়েম আছে এমনটা বলার আর অবকাশ নেই। যদি দেখা যায় সে শহরে প্রকাশ্য শিরক এর পাশাপাশি শিরক প্রকাশ পায় এমন কাজকর্ম বিদ্যমান যেমন, ব্যভিচার, সুদ, নানা রকমের জুলুম, সুন্নাহ কে বাদ দিয়ে ধর্মদ্রোহিতা ও বিদআতের প্রচলন বেড়ে যায় তাহলে সে শহরকে আর দারুল ইসলাম বলে গণ্য করা যাবে না।

যদি সে অঞ্চলের বিচার ব্যবস্থা আল্লাহর আইনের পরিবর্তে জালিম শাসক(৬) ও মুশরিকদের প্রতিনিধি(৭) কর্তৃক রচিত আইন দ্বারা পরিচালিত হয় এবং কুরআন-সুন্নাহ ব্যতিরেকে অন্য কোন মতবাদের দিকে লোকজনকে আহবান জানানো হয় তবে সেই অঞ্চলকে দারুল কুফর বলার পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গেছে। আর যদি সে অঞ্চলের শাসক তাওহীদের ধারক-বাহকদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে এবং তাদেরকে ও তাদের দ্বীনকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায় তবে দ্বীনের ব্যাপারে অল্পকিছু জ্ঞান থাকলেও কেউ এই অঞ্চলের দারুল কুফর বলে গণ্য হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ প্রকাশ করবেন না। এখন এই অঞ্চল পৃথিবীর

যেকোনো প্রান্তেই হোক না কেন উপরোক্ত লক্ষণ প্রকাশিত হলে তাকে দারুল কুফর বলেই গণ্য করা হবে।

আর উপরোক্ত সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আপনি যদি প্রমাণ খুজতে চান তাহলে সমগ্র কুরআনেই এর স্বপক্ষে অনেক প্রমাণ পাবেন। এছাড়া উলামাদেরও এ ব্যাপারে ঐকমত রয়েছে। আর এটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ইলম। গুরুত্বের দিক থেকেও এই ইলম এর অবস্থান উপড়ের দিকে। আর তাই প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বকে প্রাধান্য দেওয়ার কারণে সকল উলামারাই এ ব্যাপারে জ্ঞান রাখেন।

যে এ কথা বলে থাকে যে,

"এখানে কোন একটি অঞ্চল দারুল কুফর হওয়ার জন্য যে সকল শিরকের উপস্থিতির কথা শর্ত হিসেবে বলা হয়েছে সেগুলো (মক্কার আশপাশের) বেদুইন শ্রেণীর লোকদের মধ্যে দেখা যায়। মূল শহরের (মক্কার) লোকদের মধ্যে এগুলো তেমন একটা দেখা যায় না।" তার জন্য আমার উত্তরটি হল-

প্রথমত , এই ধরণের কথা যারা বলেন তারা অহংকারবশত বা বাস্তবতার ব্যাপারে জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে এই কথা বলে থাকেন। একথা সবাই জানে যে এই বেদুইন শ্রেণীর লোকেরা ক্বাবা, মাকামে ইব্রাহিম ও হাতিমের নিকট চাওয়া ও এর দিকে অন্যদের আহবান করা মূল শহরের বাসিন্দাদের (মক্কার বাসিন্দা) কাছ থেকেই শিখেছে। যারা তাওহীদের অনুসারী ও যাদের শোনার মতো কান আছে তারা সবাই এগুলো জানে ও শুনতে পায়।

দ্বিতীয়ত, উপরের ঘটনাটি প্রতিষ্ঠিত সত্য হওয়ার পরে এই দায় মক্কাবাসীর উপর না দিয়ে শুধুমাত্র বেদুইন শ্রেণীর বাসিন্দাদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার কোন সুযোগ নেই। আমার কাছে খুবই অবাক লাগে যে শহরে আপনাদের তাওহীদের বহিঃপ্রকাশ করার স্বাধীনতা নেই, আপনি আপনার দ্বীনকে পূর্ণভাবে প্রকাশ করতে পারেন না, আপনাকে আপনার নামাজ আড়াল করতে হয় এইজন্য যে সেখানে এমন শাসকগোষ্ঠী বিদ্যমান যারা এই দ্বীনকে ও এই দ্বীনের

অনুসারীদেরকে ঘৃণা করে ও শত্রুতা পোষণ করে তেমন ভূমিকে দারুল কুফর বলার ব্যাপারে কোন বুদ্ধিমান মানুষের কোন সংশয় থাকার প্রশ্নই আসে না।

ক্বাবা, মাকামে ইব্রাহিম বা হাতিমের কাছে সাহায্য চায় ও এর দিকে মানুষকে আহবান করে এমন কাউকে তাওহীদের অনুসারীদের (মুওয়াহহিদীন) কেউ যদি এই কথা বলে যে "হে আদম সন্তান, আল্লাহ্ ছাড়া আর অন্য কারও কাছে কিছু চাওয়া যাবে না ও এর দিকে মানুষকে আহবান করো না"। অথবা যদি এই কথা বলে যে, "তুমি একজন মুশরিক" তাহলে আমরা কি দেখতে পাই? তাওহীদের অনুসারীদের এই কথা গুলো কি স্বাধীনভাবে বলতে দেওয়া হয় নাকি এগুলো বলার কারণে তারা অন্যদের দ্বারা ষড়যন্ত্রের স্বীকার হয়?

তাই আসুন এ কথা স্বীকার করে নেই যে, যারা তাওহীদের অনুসারীদেরকে এভাবে বাঁধা দেয় সে নিজেকে কোনভাবেই তাওহীদের অনুসারী দাবি করতে পারে না। আল্লাহর শপথ সে তাওহীদের অর্থই বুঝে না। সে রাসুলাল্লাহ (সাঃ) এর দ্বীন প্রতিষ্ঠার কোন কাজে সাহায্যও করছে না।

এমন ঘটনা বিরল যে, শিরকে লিপ্ত একজন ব্যক্তি আরেকজন শিরকে লিপ্ত ব্যক্তিকে এই বলে দাওয়াত দেয় যে, "আপনারা দ্বীন ইসলামে ফিরে আসুন" অথবা "কবরস্থানে নির্মিত এই কাঠামো ধ্বংস করুন এবং আপনাদের জন্য আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও কাছে কোন কিছু চাওয়ার অনুমতি নেই "। আর একথা যদি কেও বলে তখন এই শিরকে লিপ্ত লোকজন কি তা মেনে নেয়? নাকি তাদের আচরণ তেমন হয়ে যায় যেমনটা মক্কার কুরাইশবাসী নবীজি (সাঃ) এর সাথে করেছিলো?

আল্লাহর শপথ এই সকল শিরকে লিপ্ত লোকজন তাওহীদের অনুসারীদের প্রতি কুরাইশবাসীদের মতই অত্যাচার- নির্যাতন চালায় যেমনটা চালিয়েছিল নবীজি (সাঃ) এর উপর। আল্লাহর শপথ, অনেক ক্ষেত্রে অত্যাচার ও নির্যাতনে তারা কুরাইশবাসীকেও ছাড়িয়ে যায়।(৮)

আর যদি এই অঞ্চলকে আমরা দারুল ইসলাম বলে দাবি করি তবে কেন আপনি এই সকল শিরকে লিপ্ত লোকজনকে ইসলামের দিকে ডাকছেন না? কেন তাদেরকে কবরের উপর নির্মিত স্থপতিগুলো ধ্বংসের আহ্বান করছেন না? কেন তাদেরকে শিরকে আকবর ও এর অন্যান্য রূপগুলো ছেড়ে দ্বীন ইসলামে আসার আদেশ করছেন না?(৯)

আর যদি আপনি তাদের নামাজ পড়া, রোজা রাখা, হজ্জ পালন করা ও সাদাকা করা(১০) দেখে সংশয়ে পরে যান তাহলে আসুন দেখে আসি ইতিহাস এ ব্যাপারে কি বলে-

মক্কাতে ইব্রাহিম আল খলিল (আঃ) এর ছেলে ইসমাইল (আঃ) এর মাধ্যমে তাওহীদের দিকে দাওয়াত শুরু হয়েছিলো। মক্কাবাসী এই তাওহীদের উপর বেশ কিছুকাল অটল ছিলেন। এরপর আমর ইবন লুহায়(১১) এর মাধ্যমে মক্কাতে শিরকের সূচনা ঘটে। আস্তে আস্তে পুরো জাযিরাতুল আরবে এই শিরক বিস্তার লাভ করে। আমর ইবন লুহায় এর আনা মূর্তিকে পূজার মাধ্যমে মক্কাবাসী মুশরিকে পরিণত হয় যদিও তাদের মধ্যে তখনো ইব্রাহিম (আঃ) এর দ্বীনের(১২) কিছু অংশের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। তারা মূর্তিপূজার পাশাপাশি তখনো হজ্জ পালন করতো, হাজী ও হাজীদের বাইরেও অনেককে তারা সাদাকা প্রদান করতো। এছাড়াও অন্যান্য অনেক ভাল গুণ তাদের মধ্যে ছিল। আবদুল মুত্তালিবের কবিতা ইতিহাসের বইগুলোর মাধ্যমে আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। আমরা দেখতে পাই সেখানে তিনি হাতিদের ঘটনা (সূরা ফীল এর ঘটনা)খুব সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে মক্কার সে সময়কার বাসিন্দাদের মধ্যে ইব্রাহিম (আঃ) এর দ্বীনের অংশবিশেষ এবং অন্যান্য ভাল গুণাবলীর চর্চা থাকার পরও তারা মুসলিমদের কাতারে থাকতে পারেননি। শুধু শিরকের উপস্থিতি থাকার কারণে তাদেরকে মুশরিক বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে ও তাদের ভূমিকে ‘দারুল কুফর’ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। বর্তমানে আমরা যে শিরক দেখতে পাই তা তখনকার শিরকের তুলনায় আরও ভয়াবহ।

আমরা যদি ইব্রাহিম (আলাইহিস সালাম) থেকে আরও পিছনের ইতিহাস দেখি তাহলে দেখতে পাই যে, আদম (আলাইহিস সালাম) এর পর প্রায় ১০ প্রজন্ম পর্যন্ত মানুষ দ্বীনের উপর অটল ছিল। এরপর তাদের মধ্যে কিছু ক্ষেত্রে অতিরিক্ত করার প্রবনতা দেখা গেল। তারা তাদের সময়কার বা পূর্ববর্তী পুণ্যবানদের পূজা করা শুরু করলো। আল্লাহর পাশাপাশি তারা এই সকল পুণ্যবানদের কাছে চাওয়া শুরু করলো। এভাবে আস্তে আস্তে তারা শিরকের মধ্যে ডুবে যেতে শুরু করলো। এ সময় তাদেরকে আবার তাওহীদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা নুহ (আলাইহিস সালাম)কে দুনিয়াতে পাঠালেন। আমাদের জন্য কুরআনে পূর্ববর্তী নবী ও তাদের উম্মাতকে নিয়ে যে আলোচনা করা হয়েছে সেগুলো খুব ভালভাবে অধ্যয়ন করা উচিত। এই ঘটনাগুলোতে আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা রয়েছে।(১৩)

এরপর আমরা হুদ (আলাইহিস সালাম) এর জীবনীতে দেখতে পাই যে তিনি তার কওমকে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করার দিকে ডেকেছেন। এখানে একটা খেয়াল করার মতো বিষয় হল হুদ (আলাইহিস সালাম) এর কওম আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করার কথা অস্বীকার করতো না। তারা আল্লাহ্ তা'আলার পাশাপাশি অন্যান্যদেরও ইবাদত করতো। কিন্তু তাওহীদের মূলভিত্তি হল এক আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত আর কারও ইবাদত করা যাবে না। তাই হুদ (আলাইহিস সালাম) তাদেরকে অন্য সকল ইলাহ বাদ দিয়ে ইবাদতের সকল ক্ষেত্রে এক আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ইবাদত করার আহবান জানান। ইব্রাহিম (আলাইহিস সালাম) এর ক্ষেত্রেও একই ঘটনা। তার কওম আল্লাহকেই ইবাদত করতো কিন্তু পাশাপাশি অন্যদের ইবাদতের যোগ্য মনে করতো। ইব্রাহিম (আলাইহিস সালাম) তাদেরকে এককভাবে আল্লাহ্ তা'আলার দিকে আহবান জানিয়েছিলেন।

উপরের কথাগুলোর সারসংক্ষেপ হলঃ যদি কোন অঞ্চলে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পাশাপাশি অন্য কারও ইবাদত করা হয় সেটা ইবাদতের যে কোন স্বরূপেই হোক না কেন, এই শিরকের ব্যাপারটি যদি সবার নিকট স্পষ্ট হয়ে যায়

এবং লোকজন এই শিরকের দিকেই মানুষকে আহবান করে, প্রয়োজনে এই শিরককে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যুদ্ধ করে তবে সেই অঞ্চল দারুল ইসলাম থাকার যোগ্যতা হারাবে। আর যদি পরিস্থিতি এমন দাড়ায় যে শিরকে লিপ্ত এই সকল ব্যক্তিরা তাওহীদের অনুসারীদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে এবং তাওহীদের দিকে ফিরে আসার আহবানকে প্রত্যাখ্যান করে তবে সেই অঞ্চলকে আর কিভাবে দারুল ইসলাম বলা যাবে? আর যদি এমন হয় এই শিরকে লিপ্ত লোকজন তাওহীদের অনুসারীদের সাথে সম্পর্ক ছেদ করে, তাদেরকে অভিশাপ দেয়, তাদেরকে খাওয়ারিয বলে আখ্যায়িত করে এবং বলে যে তাওহীদের অনুসরণকারীরা ভুল দ্বীনের উপর আছে তবে সে অঞ্চল কি আর দারুল ইসলাম থাকবে? আর যদি এই সকল গুণাবলি একটা অঞ্চলের জামায়াতের মধ্যে পাওয়া যায় যদিও আসলি কুফফারদের সাথে তারা বন্ধুত্ব করে না তবুও এই অঞ্চলকে দারুল কুফর ছাড়া আর কি বলা যায়?

আর এটাই হল উপরোক্ত প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে মাসআলা।

এরপরের কথা হল,

কুরআন ও সুন্নাহ থেকে আমরা যে দলিল পাই তাতে স্পষ্ট প্রমাণিত যে যদি কোন মুসলিম এককভাবে বা জামায়াতগতভাবে শিরকে লিপ্ত কোন ব্যক্তি বা জামায়াতের কাছে আনুগত্যের ও সাহায্যের ঘোষণা দেয় তাহলে সেই মুসলিম ব্যক্তি বা জামায়াতের উপর রিদ্দার (ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়া) হুকুম জারি হবে।

এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

নিশ্চয় যারা সোজা পথ ব্যক্ত হওয়ার পর তৎপ্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে, শয়তান তাদের জন্যে তাদের কাজকে সুন্দর করে দেখায় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দেয়।

(সূরা মুহাম্মাদ: ২৫)(১৪)

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেছেন,

হে মুমিনগণ, তোমরা ইহুদি ও খ্রিস্টানদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না। (সূরা মাইদাহঃ ৫১)(১৫)

এই বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশগুলো খুব ভাল করে খেয়াল করুন,

"আর কোরআনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতি এই হুকুম জারি করে দিয়েছেন যে, যখন আল্লাহ্ তা'আলার আয়াতসমুহের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন ও বিদ্রুপ হতে শুনবে, তখন তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ না তারা প্রসঙ্গান্তরে চলে যায়। তা না হলে তোমরাও তাদেরই মতো হয়ে যাবে। আল্লাহ্ দোযখের মাঝে মুনাফিক ও কাফেরদেরকে একই জায়গায় সমবেত করবেন"। (সূরা আন-নিসাঃ ১৪০)(১৬)

আল্লাহ্ সূরা আত-তাওবাতে কি বলেছেন দেখুন,

"ছলনা করো না, তোমরা যে কাফের হয়ে গেছ ঈমান প্রকাশ করার পর। তোমাদের মধ্যে কোন কোন লোককে যদি আমি ক্ষমা করে দেইও, তবে অবশ্য কিছু লোককে আজাবও দিব। কারণ, তারা ছিল গুনাহগার"। (সূরা আত-তাওবাঃ ৬৬)(১৭)

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

তারা কসম খায় যে, আমরা বলিনি, অথচ নিঃসন্দেহে তারা বলেছে কুফরি বাক্য এবং মুসলমান হবার পর অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী হয়েছে। (সূরা আত-তাওবাঃ ৭৪)(১৮)

এবং আল্লাহ্ সুব হানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

“তাছাড়া তোমাদেরকে একথা বলাও সম্ভব নয় যে, তোমরা ফেরেশতা ও নবীগণকে নিজেদের পালনকর্তা সাব্যস্ত করে নাও। তোমাদের মুসলমান হবার পর তারা কি তোমাদেরকে কুফরি শেখাবে”? (সূরা আল-ইমরানঃ ৮০)(১৯)

তাওহীদের অনুসারীদের প্রতি কাফিরদের আচরণের ব্যাপারে আল্লাহ্ সুব হানাহু ওয়া তা’আলা কি বলছেন দেখুন,

“যখন তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হয়, তখন তুমি কাফেরদের চোখে মুখে অসন্তোষের লক্ষণ প্রত্যক্ষ করতে পারবে। যারা তাদের কাছে আমার আয়াত সমূহ পাঠ করে, তারা তাদের প্রতি মারমুখো হয়ে উঠে। বলুন, আমি কি তোমাদেরকে তদপেক্ষা মন্দ কিছুর সংবাদ দেব? তা আগুন; আল্লাহ্ কাফেরদেরকে এর ওয়াদা দিয়েছেন। এটা কতই না নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল”। (সূরা আল-হাজ্জঃ ৭২)(২০)

এবং আপনি ইতিমধ্যেই এই সকল শিরকে লিপ্ত লোকজন তাওহীদের অনুসারীদের সাথে কি ধরণের আচরণ করছে তা দেখেছেন।

ইমাম হামাদ ইবনে আতিক (রহঃ) এর বক্তব্য এখানেই শেষ হল।

---

১. তার নাম আল-আল্লামাহ হামাদ ইবন আলি ইবন আতিক। তিনি নজদের(ইরাকের) উলামাদের অন্যতম একজন। তিনি আয-যুলাফি এলাকায় ১২২৭ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন । তিনি আব্দুর রাহমান ইবন হাসান আল আশ-শায়েখ কতৃক কয়েকটি শহরে বিচারক হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তার অনেক উপকারী লেখা রয়েছে। এগুলোর মধ্যে ইবতাল আত-তানদিব, শরহে কিতাব আল তাওহীদ ও সাবিল আল নাজাত ওয়াল ফিকাক উল্লেখযোগ্য। তার ছাত্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হল তার ছেলে সাদ, ইমাম আবদুল্লাহ ইবন আবদুল লতিফ, শায়েখ সুলাইমান ইবন সাহমান এবং শায়েখ হাসান ইবন আবদুল্লাহ ইবন হাসান । ইমাম হামাদ ১৩০১ হিজরিতে আল-আফলাজে

মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি ১০জন ছেলে সন্তান রেখে যান।যাদের অনেকেই পরবর্তীতে বিভিন্ন এলাকার বিচারক নিযুক্ত হয়েছিলেন। [তথ্য সুত্রঃ “নজদের উলামাগন” (১/২২৮) এবং “মাশাহির উলামা নাজদ”(২৪৪)]

২. এই নিবন্ধের প্রধান অংশটুকু ইমাম হামাদ ইবনে আতিকের “মাজমু আর-রিসালাহ ওয়াল-মাসায়েল আন-নাজদিয়্যাহ” (১/৭৪২-৭৪৬) বই থেকে নেওয়া হয়েছে।

৩. সূরা আল-বাকারাঃ ৩২

৪. এখানে এ বিষয়ে দুইটি হাদিসের কথা আলোচনায় আসে। “দোয়া হচ্ছে ইবাদতের মূল অংশ” এই হাদিসটি তিরমিজি থেকে বর্ণিত (৩৩৭১)। এই হাদিসটি আল আলবানি তার “যইফ সুনান আত-তিরমিজি” (৩৬১১)তে ‘যইফ’ বলেছেন। এব্যাপারে আরেকটি হাদিস আছে যা বেশ শক্তিশালী। এটিও তিরমিজি থেকে বর্ণিত। হাদিসটি হলঃ” দোয়াই হচ্ছে ইবাদত”। এটিকে আল আল বানী তার “সুনান আত-তিরমিজি”তে সহিহ বলেছেন(২৩৭০) ।

৫. তাহাকুম বলতে এখানে বান্দা তার জীবনের সকল ধরণের বিচারের ক্ষেত্রে তার রবের আনুগত্য করবে সে বিষয়টি বুঝানো হচ্ছে। এ বিষয়ে আবদুল আযিয ইবন বায (রহঃ) বলেন,” বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ আবেদ হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে তার রবের নিকট আত্মসমর্পণ করবে। বান্দা যদি তার জীবনের কিছু ক্ষেত্রে তার রবকে মানে আর কিছু ক্ষেত্রে রবের সৃষ্ট কোন মাখলুকাতের আনুগত্য করে তবে সে কখনোই পরিপূর্ণ আবেদ হতে পারবে না। যখন কোন বান্দা পরিপূর্ণ ভাবে নিজেকে তার রবের নিকট সমর্পণ করবে, তাকে মেনে চলবে, এবং বিচারের জন্য তার কুরআন-সুন্নাহের অনুসরণ করবে তখনই সে পরিপূর্ণভাবে আবেদ হওয়ার পথে এগিয়ে যাবে। আর যে বা যারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও কাছে আত্মসমর্পণ করবে , আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে মানুষের আইন দ্বারা বিচার চাইবে বা বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন সে আর আল্লাহর উপসনাকারী বলে বিবেচিত হবে না। সে হবে তখন তাগুতের

উপসনাকারী। ‘লা ইলাহা ইল্ললাহ’ বলে ঈমান আনার একটা শর্ত হলে উবুদিয়্যাহ (আল্লাহ্ একমাত্র ইবাদত পাওয়ার যোগ্য ও তারই ইবাদত করতে হবে) মেনে নিতে হবে। তাওহীদ আল-উবুদিয়্যাহ মানার শর্ত হল বান্দাকে তাগুত ও তাগুতি বিচারব্যবস্থা বর্জন করতে হবে।

তাই হে মুসলমান ভাইয়েরা, উপড়ের তথ্য থেকে এই কথা একদম স্পষ্ট যে আল্লাহর আইন ছাড়া আর অন্য কারও আইন মানা যাবে না এবং বিচার চাওয়া ও বিচার করা একমাত্র আল্লাহর আইন অনুসারে হতে হবে। আর এটা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা’আলার ইবাদতের একটি শর্ত। এই শর্ত না মানলে বান্দা পরিপূর্ণ ভাবে আল্লাহর ইবাদত করছে এ কথা বলা যাবে না। “ [তথ্যটি শায়েখ ইবন বাযের “মাজমু ফতওয়া ইবন বায” (১/৭৭-৮৪) বই থেকে নেওয়া হয়েছে] এই প্রসঙ্গে কুরআনের অবস্থান দেখুন –

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা বলেন,

আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, তারা দাবি করে যে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে আমরা সে বিষয়ের উপর ঈমান এনেছি এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে। তারা বিরোধীয় বিষয়কে শয়তানের দিকে নিয়ে যেতে চায়, অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে, যাতে তারা ওকে মান্য না করে। পক্ষান্তরে শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করে ফেলতে চায়। (সূরা আন-নিসাঃ ৬০)

৬. এখানে তাহাকুম বলতে সে সকল তাগুত শাসকদের কথা বলা হচ্ছে যারা আল্লাহ্ তা’আলার পাশাপাশি অন্যান্যদের আনুগত্য করে। এই জালিমরা ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

৭. এরা হচ্ছে ঐ সকল ব্যক্তি যারা অন্তরে কুফুরি ও জায়নবাদের ধারক বাহক। এদেরকে কূটনীতিক, পরামর্শদাতা এরকম তকমা দিয়ে মুসলিম দেশের শাসকেরা তাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থার অংশ করে নিয়েছে। এই জালিম শাসকেরা ক্রুসেডারদেরকে

‘অতিথি’ হিসেবে নবীজি (সাঃ) এর জাজিরাতুল আরবে আসার সুযোগ করে দিচ্ছে।

৮. আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন যে, তাওহীদের অনুসারীদের সাথে তাদের এক আল্লাহর দিকে দাওয়াতের বিনিময়ে কি আচরণ করা হয়। কেউ যদি বলে যে “তাগুতকে অস্বীকার করো ও এক আল্লাহর উপাসনা কর” অথবা “কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী কোন আইন প্রণয়ন করো না” বা “বর্তমানে মুসলিমদের বিরুদ্ধে চালানো যুদ্ধে জায়নবাদী ইহুদি ও ক্রুসেডারদের সাহায্য করো না” বা “অমুসলিম কাফিরদেরকে ‘জাজিরাতুল আরব’ থেকে বের করে দাও” ইত্যাদি বললে তার সাথে কি আচরণ করা হয়? যদি মক্কা বা তার আশে পাশের কেউ এধরণের কথা বলে তাহলে শাসকগোষ্ঠী তার সাথে কি ধরণের আচরণ করে? শাসকগোষ্ঠীকে আপনি কি তাওহীদের বানী প্রচারক এই ব্যক্তির প্রতি নমনীয় দেখতে পান? কখনোই না। বরঞ্চ আমরা দেখতে পাই যে শাসকগোষ্ঠী ঐ লোকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এরপর তাকে বন্দী করে তার উপর অবর্ণনীয় নির্যাতন চালানো হয়। অবশেষে তাকে হত্যা করা হয় অথবা কুফফার ক্রুসেডারদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

৯. একইভাবে আপনি যদি কোন ভূমিকে দারুল-ইসলাম মনে করেন তাহলে কেন সেখানে আল্লাহ্‌র আইন বাস্তবায়ন করার কথা বলছেন না? কেন লোকজনকে পার্লামেন্টগুলোকে ধ্বংস করে দেওয়ার কথা বলছেন না? কেন শাসকদের কুফফারদের বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা করা ও তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশে নিষেধ করছেন না? আল্লাহর একত্ববাদের প্রতিষ্ঠা ও দাওয়াতের কাজে কেন তাদেরকে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পরার আদেশ দিচ্ছেন না?

১০. এই অংশটুকু ভালভাবে বুঝার জন্য শায়খুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব (রহঃ) এর “কাশফ আশ-শুবুহাত” বইটি দেখতে পারেন।

১১. ইব্রাহিম (আঃ) মারা যাওয়ার পর আরবে ইনিই প্রথম শিরকের প্রচলন করেন। ইবন ইসহাক বলেন-“ আমর ইবন লুহাই প্রথম ব্যক্তি যে ইব্রাহিম (আঃ) এর দ্বীনে পরিবর্তন এনেছিল এবং মূর্তি নির্মাণ করেছিলো”।

১২. তারা এই শিরকে লিপ্ত থাকা অবস্থাতেও ইব্রাহিম (আঃ) এর দ্বীনের কিছু অংশ মেনে চলতো। যেমন তারা হজ্জ পালন করা, রোজা রাখা, সাদাকা করা এই ইবাদতগুলো তখনও করতো। এই তথ্য ও ব্যাখ্যা কাশফ আশ-শুবুহাত এর ব্যাখ্যা থেকে নেওয়া হয়েছে।

১৩. কাশফ আশ-শুবুহাত এর ব্যাখ্যা থেকে নেওয়া হয়েছে।

১৪. সূরা মুহাম্মাদঃ ২৫

১৫. সূরা আল-মাইদাহঃ ৫১। আল-আল্লামাহ ইবন হাযম এই আয়াতের ব্যাপারে বলেন-“ এই আয়াতের শাব্দিক অর্থকেই গ্রহণ করতে হবে। মুসলিমদের কেউ আসলি কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করলে সেও তাদের মধ্যে থেকে একজন বলে গণ্য হবে। এটা এমন পরিষ্কার একটা বিষয় যে এ ব্যাপারে কোন মুসলিমই দ্বিমত পোষণ করবে না। [আল-মুহাল্লাহ (১১/১৩৮)]

১৬. সূরা আন-নিসাঃ ১৪০

১৭. সূরা আত-তাওবাঃ ৬৬

১৮. সূরা আত-তাওবাঃ ৭৪

১৯. সূরা আল-ইমরানঃ ৮০

২০. সূরা আল-হাজ্জঃ ৭২